১১.৩ বৌদ্ধধর্ম (Buddhism)

বৌদ্ধধর্ম হল অন্যতম বিশ্বধর্ম। গৌতমবুদ্ধের জীবনী ও বাণীই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি। তাঁর পূর্ব নাম ছিল সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থ সংসার জীবনে মানুষের নানা ধরনের দুঃখকষ্ট দেখে খুবই বিচলিত হন এবং সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দুঃখের অবসানের আবিষ্কারের চেষ্টায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেন। অবশেষে তিনি সত্যলাভ করে 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী বলে পরিচিত হন। তিনি তাঁর উপলব্ধ জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচারের পর আশি বছর বয়সে বারাণসীতে দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধদেব মুখে মুখেই ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁর জীবৎকালে কিছুই লিখিত হয়নি। তার মৃত্যুর কিছুকাল পরে মগধের কাছে রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর) তাঁর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ এক ধর্মমহাসভা আহ্বান করেন। এই মহাসভায় বুদ্ধের উপদেশ ও বাণী সম্বন্ধে মতৈক্যে আসার চেষ্টা করেন। এই ধর্মমহাসভাতেই 'ত্রিপিটক' সংকলিত হয়। 'পিটক' শব্দের অর্থ পেটিকা বা বাক্স। সুতরাং ত্রিপিটক বলতে তিনভাগে বিভক্ত বৌদ্ধবাণী বোঝায়। পিটক তিনটি হল, সূত্তপিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক। ত্রিপিটক পালি ভাষায় লিখিত। সূত্তপিটকে মূলত বুদ্ধের বাণী, উপদেশ ও শিষ্যদের

Scanned by CamScanner

সঙ্গে কথোপকথন বিবৃত হয়েছে। সূত্তপিটকেই দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে বুদ্ধদেবের নিজস্ব মতামত পাওয়া যায়। বিনয়পিটকে বৌদ্ধসংঘ বিষয়ে নির্দেশ এবং সংঘের পালনীয় বিধি ও অনুশাসন সংকলিত হয়েছে। অভিধর্ম পিটকে আছে মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য তাত্ত্বিক আলোচনা। এই পিটক তিনটি ছাড়া বৌদ্ধধর্ম বোঝার জন্য 'থেরগাথা', 'থেরিগাথা', 'জাতক', 'ধম্মপদ', 'মিলিন্দপনহো', 'দীপবংশ', 'মহাবংশ', 'বিশুদ্ধিমার্গ' এবং ত্রিপিটকের নানা ভাষ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রয়োজন। তবে সূত্তপিটকের উপর ভিত্তি করে লিখিত 'ধম্মপদ' বৌদ্ধদের দার্শনিক তত্ত্বগুলির উপর রচিত একটি উৎকৃষ্ট এবং বৌদ্ধদর্শন বোঝার অন্যতম মূল অবলম্বন। সূত্তপিটক পাঁচটি অংশে বা নিকায়ে বিভক্ত। পাঁচটি নিকায় হল (১) দীঘনিকায়, (২) মজঝিম নিকায়, (৩) সংযুক্ত নিকায়, (৪) অঙ্গুত্তর নিকায় ও (৫) খুদ্দক নিকায়।

বুদ্ধদেব তাঁর দীর্ঘকালের তপস্যালব্ধ সত্যকে কেবলমাত্র চারটি আর্যসত্যে বিধৃত করেছেন। এই চারটি আর্যসত্য হল (১) জগতে দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং (৪) দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে।

প্রথম আর্যসত্য হল জগতে দুঃখ আছে। জীবের জীবন দুঃখে পূর্ণ। জন্ম, জরা, শোক ও মৃত্যু জীবের নিত্যসঙ্গী। অপ্রীতিকর বস্তুর সংস্পর্শ ও প্রীতিকর বস্তুর বিচ্ছেদ, অতৃপ্ত কামনাবাসনা, দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি হল দুঃখের সাধারণ কারণ। জীবের জীবন দুঃখের উপরোক্ত কারণগুলির দ্বারা আচ্ছাদিত। এর ফলে দুঃখবিহীন জীবন কল্পনার অতীত।

কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন যে জগতে দুঃখ আছে সত্য, কিন্তু সুখও তো আছে। তাই জগৎকে শুধুমাত্র দুঃখময় বলা ঠিক নয়। বরং বলা যায় সুখ ও দুঃখ জীবের জীবনে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। বুদ্ধদেব এইরূপ ধারণাকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন জীবের জীবনে যে আপাত সুখের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা দুঃখেরই নামান্তর। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত তাই সে যথার্থ সুখের পরিচয় জানে না। অজ্ঞতাজন্য শিশু যেমন নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়ে আপাত সুখ বোধ করে, অবিদ্যাগ্রস্ত জীবও তেমনি ইন্দ্রিয় সম্ভোগ এবং ভোগলালসার পরিতৃপ্তিকে সুখ বলে মনে করে। কিন্তু শিশুর ঐ আপাত সুখ আসলে অসুখকেই আহ্বান করে। অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ভোগলালসাকে পরিতৃপ্ত করে না, বরং তাকে তীব্রতর করে। ভাগবতে যেমন বলা হয়েছে—ন জাতু কামঃকামানাং উপভোগেন শাম্যতি—উপভোগে কামের পরিতৃপ্তি হয় না। বুদ্ধদেবও প্রায় একই কথা বলেন। ভোগলালসা অন্তহীন তাই ইন্দ্রিয় সম্ভোগেরও পরিতৃপ্তি নেই। যখন বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয় তখন জীব এই জগৎসংসারকে একান্ত দুঃখময় বলে বুঝতে পারে। ধম্মপদে বুদ্ধদেব বলেছেন যে

Scanned by CamScanner

আকাশে অথবা সমুদ্রের গভীরে বা পর্বতের গুহায় অর্থাৎ সারা বিশ্বে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। এজন্য দুঃখের অনিবার্যতা বৌদ্ধদর্শনের প্রথম ও প্রধান কথা।

দ্বিতীয় আর্যসত্য হল দুঃখের কারণ আছে। বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন জীবন দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাক। জগৎ দুঃখময় বললেই দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। কোনকিছুর নিবৃত্তি তার কারণের উপর নির্ভর করে। দুঃখের নিবৃত্তি করতে হলে যে কারণের জন্য দুঃখ হয় সেই কারণের নিবৃত্তি দরকার। যে তত্ত্বের সাহায্যে বুদ্ধদেব দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সেই তত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। প্রতীত্যসমুৎপাদ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল "কারণ সহযোগে উৎপত্তি"। কোন বস্তুর উৎপত্তি কোন না কোন কারণের জন্য। কারণ ছাড়া কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না। তাই জগতে যে দুঃখ আছে তার কারণও আছে। সেই কারণের আবার কারণ আছে। দুঃখের উৎপত্তির এই কারণ পরম্পরাকেই বৌদ্ধধর্মে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম মতে দুঃখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বারোটি কারণ আছে। একে বলা হয় দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্র। দুঃখের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণগুলি একত্রে এক কারণ শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে—এই কারণ শৃঙ্খলকেই 'ভবচক্র' বলা হয়ে থাকে। এই ভবচক্রে বারোটি নিদান থাকায় একে দ্বাদশ নিদানও বলা হয়। এই দ্বাদশ নিদানকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা হয়—

১. অবিদ্যা	অতীত জীবন
২. সংস্কার	
৩. বিজ্ঞান	বর্তমান জীবন
৪. নামরূপ	
৫. ষড়ায়তন	
৬. স্পর্শ	
৭. বেদনা	
৮. তৃষ্ণা	
৯. উপাদান	
১০. ভব	
১১. জাতি	ভবিষ্যৎ জীবন
১২. দুঃখ	

ব্যাধি, জরা, মরণ, শোক ইত্যাদি হল দুঃখ। এই জরা মরণাদির কারণ হল জন্ম বা জাতি। আমাদের জন্ম হয় বলেই দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। আমরা যদি না

Scanned by CamScanner

জন্মাতাম তবে আমাদের কোন দুঃখকষ্টও থাকতো না। কিন্তু এই জন্ম বা জাতি বিনা কারণে হয় না। জন্মেরও কারণ আছে। জন্মের কারণ হল জন্মাবার ইচ্ছা যাকে ভব বলা হয়েছে। আবার জন্মাবার জন্য আমাদের মধ্যে প্রবল প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। একেই বলা হয় **ভব**। জন্মের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আমাদের জন্ম হয়। জন্মের এই আকাঙ্ক্ষা আসে বিষয়ভোগের আসক্তি থেকে। জাগতিক বিষয়ের প্রতি এই আসক্তিকেই বলা হয় **উপাদান**। আগের জন্মের বিষয়ভোগ আবার বিষয়ভোগের আসক্তিকে তীব্রতর করে। উপাদান বা বিষয়ভোগের আসক্তির কারণ হল **তৃষ্ণা**। ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষাই হল তৃষ্ণা। বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিষক্রিয়ার মতো মানুষকে বিষয়ভোগ তথা জন্মের প্রতি উন্মত্ত করে তোলে। তাই তৃষ্ণা জরামরণ শোকাদির একটি প্রধান কারণ। তৃষ্ণার কারণ হল **বেদনা**। বিষয়ের পূর্বভোগ যে আপাত সুখকর অনুভূতির সৃষ্টি করে তাকেই বলা হয় বেদনা। এই বেদনাই বস্তুভোগের প্রতি তৃষ্ণার সৃষ্টি করে থাকে। **স্পর্শ** বেদনার কারণ। স্পর্শ হল বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। এই সংযোগের কারণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ছয়টি ইন্দ্রিয়। একেই বলা হয় **ষড়ায়তন**। জগতের বস্তুর যাবতীয় অভিজ্ঞতা ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আমাদের দেহমন গ্রন্থি এই ষড়ায়তনের কারণ। প্রত্যেক জীব দেহ ও মনের এক সমন্বিত সত্তা। এই সত্তাকেই বলা হয় **নামরূপ**। নামরূপের কারণ হল **বিজ্ঞান**। বিজ্ঞান বলতে চেতনা বোঝায়। ভূমিষ্ঠ হবার আগে যে প্রাথমিক চেতনা মাতৃগর্ভে ভ্রূণের আকার ধারণ করে তাই হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান যদি না থাকত তবে দেহ ও মনের সৃষ্টি বা পুষ্টি হত না। পূর্বজন্মের সংস্কার থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাই **সংস্কার** হল বিজ্ঞানের কারণ। আবার সংস্কার উৎপন্ন হয় **অবিদ্যাজনিত** আসক্তি বা কামনার ফলে। অবিদ্যার অর্থ সম্যকজ্ঞানের অভাব। যা সত্য নয়, তার প্রতি আকর্ষণই অবিদ্যার ফল। অবিদ্যা থেকে ক্রমান্বয়ে দুঃখের অন্যান্য কারণগুলি উদ্ভূত হয় বলে অবিদ্যাকে সবরকম দুঃখের মূল কারণ বলা হয়।

উপরে বর্ণিত কারণশৃঙ্খল থেকে বোঝা যায় যে কার্যের দিক থেকে দুঃখ হল সর্বশেষ উৎপন্ন কার্য আর কারণের দিক থেকে অবিদ্যা সর্বশেষ কারণ। মূল কারণ অবিদ্যা থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে বিজ্ঞান বা চেতনা, বিজ্ঞান থেকে নামরূপ সংঘাত, নামরূপ থেকে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান, উপাদান থেকে ভব, ভব থেকে জাতি বা জন্ম, জাতি থেকে জরা, মরণ, শোকাদি দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই হল দ্বিতীয় আর্যসত্য।

তৃতীয় আর্যসত্য হল দুঃখের নিবৃত্তি আছে। যা কিছু উৎপন্ন হয় তারই বিনাশ হয়। দুঃখ যেমন উৎপন্ন হয় তেমনি দুঃখেরও বিনাশ হয়। দুঃখ হল কার্যবস্তু। একটি কারণ

Scanned by CamScanner

শৃঙ্খল থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ঐ কারণ শৃঙ্খলের বিনাশ ঘটলে দুঃখেরও বিনাশ হয় অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের মূল বা আদি কারণ। তাই দুঃখের বিনাশের জন্য ঐ মূল কারণ অবিদ্যার নাশ হওয়া প্রয়োজন। অবিদ্যার বিনাশে সংস্কারের বিনাশ, সংস্কারের বিনাশে বিজ্ঞানের বিনাশ। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব বিনষ্ট হয়ে জীবের জন্ম বা জাতি রুদ্ধ হয়। এই দুঃখরোধ দুঃখের মূল উৎপাটনের মাধ্যমে হয়ে থাকে বলে এই দুঃখরোধ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। দুঃখের এই আত্যন্তিক নিরোধকে বলা হয় **নির্বাণ**। এইরূপ অবস্থায় ভোগবাসনা বলে আর কিছু থাকে না। ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মানুষ ভবচক্র থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করে। নির্বাণ এমন একটি অবস্থা যা শুধু দুঃখের অতীতই নয়, এটি এমন একটি অবস্থা যা আনন্দময়, স্থির ও শান্ত। এই হল তৃতীয় আর্যসত্য।

চতুর্থ আর্যসত্য হল দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। বুদ্ধদেবের মতে দুঃখের অপসারণ করার পথই হল দুঃখনিবৃত্তির পথ। এই পথের আটটি অঙ্গ বা স্তর আছে। তাই বৌদ্ধধর্মে এই পথকে "অষ্টাঙ্গিক মার্গ" (Eight fold path) বলা হয়। বুদ্ধদেবের মতে এই পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত। ভিক্ষু, অভিক্ষু সকলেই এই একই পথ অনুসরণ করবে। আলাদা কোন বিশেষ পথের ব্যবস্থা নেই। এই পথের বা মার্গের আটটি স্তর হল (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক, (৪) সম্যক কর্মান্ত, (৫) সম্যক আজীব, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি, (৮) সম্যক সমাধি। একে একে এগুলি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) **সম্যক দৃষ্টি (Right views)** ঃ চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হল সম্যক দৃষ্টি। অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা থেকেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মিথ্যাজ্ঞান উদ্ভূত হয়। সুতরাং জগৎ ও জীবনের স্বরূপ এবং দুঃখের উৎপত্তি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ছাড়া 'মুক্তি' সম্ভব নয়। একমাত্র আর্যসত্যগুলি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। তাই সম্যক দৃষ্টি অপরিহার্য।

(২) **সম্যক সংকল্প (Right determination)** ঃ পার্থিব বস্তু সম্পর্কে আসক্তি, ভোগবিলাস, হিংসা, রাগ ও দ্বেষ বর্জন করার দৃঢ় ইচ্ছাই সম্যক সংকল্প। শুধুমাত্র আর্যসত্যগুলি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানানুসারে কর্ম করার সংকল্পেরও প্রয়োজন। সুতরাং মুক্তিকামী মানুষকে পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তি ভোগ-তৃষ্ণা, অন্যের প্রতি কুভাব প্রভৃতি বর্জন করতে হবে এবং অন্যের ক্ষতিসাধন করা থেকে বিরত থাকার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে

Scanned by CamScanner

যে সম্যক সংকল্প ভিন্ন সম্যক দৃষ্টি অর্থহীন। তাই মুক্তিকামী মানুষকে সম্যক সংকল্পবতী হতে হবে।

(৩) **সম্যক বাক (Right speech)** ঃ মিথ্যা কথা বলা, কটু কথা বলা, পরনিন্দা ইত্যাদি বর্জন করাই বাক সংযমের লক্ষণ। কেবল সৎসংকল্প গ্রহণ করলে মুক্তি আসে না, সংকল্প অনুসারে কাজ করারও প্রয়োজন আছে। এজন্য প্রথমেই বাক্ সংযমই প্রয়োজন। বাক্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিকামীর আত্মনিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হয়। সাধু সংকল্প শেষ কথা নয়, মুক্তিকামী ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা, কটুবাক্য, অসার কথা, সত্য গোপন, পরনিন্দা ইত্যাদি খারাপ দোষগুলি বর্জন করতে হবে। এখানেই সম্যক বাকের বা বাক্য সংযমের গুরুত্ব।

(৪) **সম্যক কর্মান্ত (Right conduct)** ঃ চুরি, হিংসা, কামভোগ, মিথ্যা কথা বলা ও নেশা এই পাঁচটি বিষয় থেকে বিরতি হল পঞ্চশীল। এগুলি সম্যক কর্মাঙ্গের অন্তর্গত। কেবল সংযত বাক্য বললে চলবে না, সংযত আচরণেরও প্রয়োজন আছে। সম্যক কর্মান্ত বলতে বোঝায় নিঃস্বার্থ কর্ম। স্তোত্রপাঠ করে, আর পূজার্চ্চনা করে কোন মানুষ নৈতিক গুণসম্পন্ন হতে পারে না। গঙ্গাকে পবিত্র নদী বলে বিবেচনা করে গঙ্গাস্নান করলে মনের মলিনতা দূর হয় না। এজন্য বুদ্ধদেব এইসবকে সমর্থন করেননি। মুক্তিকামীকে প্রাণী হত্যা, চৌর্যবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সেবা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। স্বার্থবোধ ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে হবে।

(৫) **সম্যক আজীব (Right livelihood or Right living)** ঃ সৎ উপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই হল সম্যক আজীব। ব্যবহারিক জীবনযাপন করা বুদ্ধদেব অস্বীকার করেননি। কিন্তু নিছক কৃচ্ছ্রসাধনে সত্য লাভ হয় না। শরীরকে সুস্থ ও জীবনযাপনকে সুষ্ঠু করার জন্য নানা উপকরণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপকরণ প্রয়োজন বলেই তা যেকোন উপায়ে অর্জন করতে হবে তা ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় উপকরণ সৎভাবে অর্জন করতে হবে। প্রবঞ্চনা, কপটতা, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি নিষিদ্ধ উপায় অবলম্বন করে জীবনের উপকরণ সংগ্রহ অনুচিত ও সর্বথ পরিত্যজ্য।

(৬) **সম্যক ব্যায়াম (Right effort)** ঃ 'ব্যায়াম' শব্দের অর্থ চেষ্টা, শ্রম, অনুশীলন। শারীরিক ব্যায়াম করলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে, মানসিক ব্যায়ামে তেমনি মন বা চিন্তা সুস্থ থাকে। চঞ্চল মনকে শান্ত করার জন্য প্রয়োজন হল (ক) মনে আসা অসৎ চিন্তাকে মন থেকে দূর করা, (খ) নূতন অসৎ চিন্তার উদয় ঠেকিয়ে রাখা, (গ) মনে সৎ চিন্তা ও কুশলভাবের উদয় ঘটানো এবং (ঘ) উদিত সৎ চিন্তা ও কুশলভাবকে মনে লালনপালন ও পোষণ করা। মন যেহেতু সদাচঞ্চল সেহেতু সৎচিন্তা নিরন্তর অনুশীলন ছাড়া অসৎ চিন্তার পুনরায় আগমন রোধ করা সম্ভব নয়। একমাত্র শান্ত ও নির্মলচিত্ত ব্যক্তিই নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম।

Scanned by CamScanner

(৭) **সম্যক স্মৃতি (Right mindedness or Right thought)** ঃ সকল বস্তুর যথার্থরূপের স্মরণই হল সম্যক স্মৃতি। চারটি আর্যসত্য, ভোগ, আয়তন এবং যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক অবস্থার যথার্থবোধ সর্বদা মনে রাখতে হবে। যথার্থ বোধের স্মরণের অভাবে অর্জিত বোধ লুপ্ত হতে পারে আর তার ফলে জীব আবার অবিদ্যাগ্রস্ত হতে পারে। তাই বিদ্যালাভই নির্বাণলাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অর্জিত বিদ্যার যাতে বিস্মৃতি না হয়, অবিদ্যা যাতে পুনরায় ফিরে না আসে তার জন্য যাবতীয় বস্তুস্বরূপের যথাযথ বা সম্যক স্মরণ প্রয়োজন। বস্তুস্বরূপের সম্যক স্মরণে জীবের পক্ষে অনিত্য বস্তুর কামনা বাসনা পরিত্যাগ করা সহজতর হয়। এতে নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত হয়।

(৮) **সম্যক সমাধি (Right concentration)** ঃ সম্যক সমাধি হল দুঃখনিরোধ মার্গের সর্বশেষ স্তর। মনঃসংযোগের নামই 'সমাধি'। যে ব্যক্তি পূর্বের সাতটি স্তর যথার্থভাবে অনুসরণ করেছেন এবং নৈতিক পরিশুদ্ধি লাভ করেছেন তিনিই ধ্যানের মাধ্যমে নির্বাণ লাভের অধিকারী। সমাধিতে সাধক প্রথমে শান্ত, আনন্দময়, উদাসীন অবস্থায় অবস্থান করেন। পরে সাধক সর্বপ্রকার অনুভূতিবিহীন হয়ে আত্মসমাহিত হন।

সমাধি বা মনঃসংযোগের চারটি স্তর আছে।

প্রথম স্তরে মুক্তিসাধক স্থির ও শান্ত মনে চারটি আর্যসত্য নিয়ে বিতর্ক ও বিচার করবেন। এতে সাধক অনাসক্তি ও শুদ্ধ চিন্তাজাত আনন্দ অনুভব করেন।

প্রথম স্তরের ধ্যানের ফলে সাধকের মনে চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে তখন সাধক নিশ্চিন্ত চিত্তে গভীরভাবে ধ্যানস্থ হন। এটা হল ধ্যানের দ্বিতীয় স্তর।

ধ্যানের তৃতীয় স্তরে সাধক পূর্বানুভূতি ধ্যানানন্দের অনুভূতিতে নিস্পৃহ হন। ফলে ধ্যানের গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে সাধক পূর্ণ প্রশান্তি অনুভব করে থাকেন। তখনও অবশ্য ক্ষীণ দৈহিক আনন্দের অনুভূতি থাকে।

ধ্যানের চতুর্থ ও সর্বশেষ স্তরে সাধকের দৈহিক আনন্দানুভূতিরও অবসান হয়। এই অবস্থায় সাধকের সুখদুঃখের কোন অনুভূতি থাকে না। এই হল পূর্ণ শান্তি ও সমতার অবস্থা। মানুষ অহংকার বা আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সত্তাকে সর্বভূতে প্রসারিত করে। মানুষের এই ক্রমপরিণতি আসে ব্রহ্মবিহারের (four sublime moods) মধ্য দিয়ে।

মৈত্রী (friendliness of love), করুণা (Compassion or mercy), মুদিতা (Cheerfulness) এবং উপেক্ষা (Impartiality)—এই চারটির একাগ্রচিত্তে ভাবনাকে

Scanned by CamScanner

ব্রহ্মবিহার বলে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা চিত্তে আশ্রিত হলে সমস্ত প্রাণীর প্রতি হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি আর থাকে না। এই ভাবনা মানুষের চিত্তকে বৈরীরহিত করে।

বুদ্ধদেব বলেছেন মৈত্রী ভাবনার দ্বারা দ্বেষের ক্ষয় হয়। করুণা ভাবনার দ্বারা হিংসাবৃত্তির অবসান হয়। মুদিতা ভাবনার দ্বারা বৈরী বা শত্রুভাবের অবসান ঘটে এবং উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা প্রতিহিংসা বৃত্তির লয় হয়।

মৈত্র্যাদি ভাবনার দ্বারা আধিভৌতিক শান্তিলাভ হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন যে যার সর্বভূতের প্রতি মৈত্রী আছে তার প্রতি কারও হিংসা বা শত্রুভাব থাকে না। এমনকি হিংস্র জন্তুরাও তার কোনো অনিষ্ট করে না।

ব্রহ্মবিহার সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেছেন যে সর্বলোকের প্রতি দ্বেষবর্জিত হয়ে মৈত্রীভাবযুক্ত হওয়া উচিত। সর্ব অবস্থায় তিনি মানুষকে এইভাবে অধিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। "দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবেশনে, শয়নে যতক্ষণ জাগ্রত থাকবে ততক্ষণ এই মৈত্রীভাবে থাকা কর্তব্য"। এইভাবে অধিষ্ঠিত থাকার নামই ব্রহ্মবিহার (Four sublime moods)।

আগেই বলেছি বুদ্ধদেব নিজে কিছু লিখে যাননি। তিনি মুখে মুখেই ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর) তাঁর ভক্ত ও শিষ্যগণ এক ধর্মমহাসভা (First council) আহ্বান করেন এবং সূত্রপিটক ও বিনয়পিটক গ্রথিত হয়। এখানে অভিধর্মের কোন উল্লেখ ছিল না। এরপর ভিক্ষুদের মধ্যে আচরণের নিয়মাবলী নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ১০০ বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় ধর্মমহাসভা (Second council) আহ্বান করা হয়। ভিক্ষুদের এক বিরাট অংশ সংঘে আচরণের নিয়মবিধি উপযোগী নয় বলে দাবি করতে থাকেন। এরা এই নিয়মবিধি পরিবর্তনের দাবি করতে থাকেন। কিন্তু ধর্ম মহাসভা তা মানতে রাজি হয়নি। প্রতিবাদী ভিক্ষুদের সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ভিক্ষুগণ একটি আলাদা সভা করেন যাতে ১০ হাজার ভিক্ষু সমবেত হন। এই ভিক্ষুদের বলা হয় মহাসংঘিক। আর রক্ষণশীল ভিক্ষুগণ থেরাবাদী বা স্থবিরবাদী বলে পরিচিত হন। মহাসংঘিকগণ Supernatural Buddha বা লোকোত্তর বুদ্ধের তত্ত্ব উপস্থিত করেন। বুদ্ধকে আর সাধারণ মানুষ বলে বিবেচনা না করে ঈশ্বরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অশোকের রাজত্বকালে ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় ধর্মমহাসভা (Third council) অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আর একটি বিভাজন হয়। তৃতীয় ধর্ম মহাসভা থেকে বহিষ্কৃত ভিক্ষুগণ নালন্দাতে এক মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সামগ্রিকভাবে এরা সর্বাস্তিবাদী বলে পরিচিত। মৌর্যশাসনের শেষের দিকে (200 B.C.) এরা

Scanned by CamScanner

প্রথমে মথুরাতে ও পরে কাশ্মীর ও গান্ধার (বর্তমান আফগানিস্তানের কান্দাহার) দেশে চলে যান। কাশ্মীর ও গান্ধারের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ নিজেদের মূল সর্বাস্তিবাদী বলতেন। ১০০ শতাব্দীতে (100 A.D.) রাজা কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্থ ধর্মমহাসভা (Fourth council) অনুষ্ঠিত হয়। কনিষ্ক একটি বড়ো গোছের সংঘ স্থাপন করেন। এই সংঘে ৫০০ জন পণ্ডিত ভিক্ষু ছিলেন। তারা সুত্র, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকের উপর ভাষ্য রচনা করেন। প্রত্যেকটি ভাষ্যে এক লক্ষ করে শ্লোক ছিল।

রাজগৃহে সংকলিত বুদ্ধবাণীই বুদ্ধদেবের শিক্ষার বিশুদ্ধ রূপ। এরাই **হীনযান** সম্প্রদায় রূপে পরিচিত। মহাসংঘিকদের যে সম্প্রদায় তা **মহাযান** নামে পরিচিত হয়। বুদ্ধদেবের দার্শনিক ধ্যানধারণাকে কেন্দ্র করে চারটি প্রধান উপসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই চারটি উপসম্প্রদায় হল ঃ বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। তাঁদের প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদগুলি হল ঃ বাহ্যপ্রত্যক্ষবাদ, বাহ্যানুমেয়বাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ।

Scanned by CamScanner